বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙালির সংহতির সমস্যা

আবদুর রাউফ

মাঝে মাঝে মনে হয় বাংলা কথাসাহিত্যের প্রারম্ভিক পর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো একজন এত বড় প্রতিভাধর সাহিত্যিকের প্র াদুর্ভাব না ঘটলেই বোধ হয় ভালো হত, ক্ষমতা তাঁর অনেক বেশী ছিল বলেই বাঙালির সাহিত্য এবং মননশীলতার ক্ষেত্রে লাভ যত হয়েছে, ক্ষতি সেই তুলনায় কিছু কম হয়নি। তাঁরসৃজনশীলতার সোনার কাঠির ছোঁয়া না পেলে জ াতীয়তা এবং হিন্দুত্বের আভেদারক ধারণা কখনই এদেশে এতটা প্রাবল্য লাভ করত বলে মনে হয় না। এইরকম একটা মতাদর্শের উদ্‌গাতা বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য নিজে নন। কারণ সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর সক্রিয়তা শুর কিছুকাল আগে থেকেই এদেশের ইংরেজি শিক্ষিত কিছু বুদ্ধিজীবীর মানসিকতায় হ্বি এবং জাতীয়তার আভেদাত্মক ধারণাটি দানা বাঁধতে শু করেছিল, বিষয়টি সম্পত্রে সুরজিৎ দাশগুপ্তের 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' বই থেকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি বোধ করি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। "১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্ডার কানিংহামের নেতৃত্বে প্রত্নাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খনন কার্যের থেকেই ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে আলোকসম্পাতের পর্ব শু হয়, তারই সত্রালে আরন্ধ ম্যাকসঅমুলার, উইলসন, ফ ার্গুসন প্রভৃতি ভারতবিদ্যামূলক গবেষণার ফলাফল সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ..... ব্রিটিশের শিক্ষায় ও শক্তিতে আভিভূত, নিজদের দুর্দশায় হীনমন্য ভারতীয়রা সহসা অবিষ্কার করল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অতুলনীয় মহত্ত্ব ..... যদ্যি প্রাচীন ভারতীয়রা নিজেদেরকে হিন্দু বলে ঘোষণা করেনি এবং প্রাচীনকালে হিন্দু কলেজ, হিন্দু মেলা ইত্যাদির মতো হিন্দু ধর্ম, হিন্দু দর্শন, হিন্দু সমাজ বলে কোনও ধর্মদর্শন সমাজের অস্তিত্ব ছিল না, তবু উনিবিংশ শতাব্দী থেকে ভারতবর্ষের সমস্ত কিছুতেই হিন্দুত্বে চিহিত করার রীতি প্রচলিত হলো।

" উল্লেখিত পরিপ্রেক্ষিতে রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা'-র বিষয়ে বত্তৃতায় বললেন, '.... দেখিতেছি, আবার আম ার সম্মুখে মহাবল পরাত্রান্ত হিন্দু জাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুন্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিত্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতেপ্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নবয়ৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম জাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে। এই আশাপূর্ণা হৃদয়ে ভারতের জয়োচচারণ করিয়া আমি অদ্য বত্তৃতা সমাপন করিতেছি।' (পৃ. ১৫৭) কিন্তু এই ধরনের বত্তৃতার দ্বারা হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তার আদর্শ জাতীয় জীবনের খুব গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার তেমন সম্ভাবনা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' লিখে, 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের উদ্ভাবন ঘটিয়ে যে কাজটি করে দিলেন, তাকে এককথায় বলা যায় অমোঘ। ভারতবর্ষের মতো বহু ধর্ম এবং বহু জাতির দেশে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু এলিটদের মনে উপন্যাসের মতো শক্তিশালী নান্দনিক মাধ্যমের দ্বারা এমন একটা মতাদর্শ একখানি গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যাওয়ার ফল যে কতখানি বিষময় হয়েছে বঙ্কিম পরবর্তী ভারতবর্ষেরক বিশেষ করে বাঙালি জা তির দুর্দশা তার স্বাক্ষর বহন করে। হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নে বাঙালি দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। বাংলার অন্যান্য নিম্নবর্ণের সম্প্রদায় এবং আদিবাসী গোষ্ঠীগুলিও সামগ্রিক বাঙালিত্বের চেতনায় কখনই উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি।

অনেকেই হয়ত বলবেন, এর দায় কি পুরোপুরি বঙ্কিমচন্দ্রের ঘাড়েই চাপাতে হবে না, তা নিশ্চয়ই নয়; কিন্তু মনে রাখতে হবে এই ব্যাপারে বাকি যাঁদের ভূমিকা রয়েছে তাঁরা কেউই বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের স্রষ্টা নয়, তাঁরা কেউই 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবী চৌধুরানী' (১৮৮৪) এবং 'সীতারাম' (১৮৮৭) নামক ত্রয়ী উপন্যাস লিখে সেগুলিকে হিন্দুত্ববাদী জ াতীয়তাবাদের 'প্রচারের কল' হিসাবে স্বয়ং দাবি করেননি। বত্তৃতা দিয়ে, প্রবন্ধ লিখে, কিংবা ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদী সংগঠন গড়ে তুলে উল্লেখিত মতাদর্শকে গণমানসে যতখানি প্রোথিত করা সম্ভব, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অমিত ক্ষমতাধর লেখকের উপন্যাস যে সে তুলনায় অনেক বেশি অমোঘ হাতিয়ার, একথা শিক্ষিত বুদ্ধিমান পাঠকগণকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন পড়ে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুত্ব যে পুরোপুরি আর্যহিন্দুত্বের ধারণাপুষ্ট ছিল এতেও সংশয়ের কোন অবকাশ তিনি রাখেননি। 'বাঙ ালীর উৎপত্তি' নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'আমাদিগের একটি প্রাচীন ধর্ম আছে, চারি হাজার বৎসর হইতে সেই ধর্ম নানাবিধ

কাব্য দর্শন ও উচচনৈতিক তত্ত্বের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া লোকমনোমোহন হইয়াছে, ... অনার্যদিগের মধ্যে তেমন উজ্জ্বল বা শোভিত কোন জাতীয় ধর্ম্ম নাই। অনেক স্থলে একেবারে কোন প্রকার জাতীয় ধর্ম্ম নাই। এমত অবস্থায় অধীন অনার্য্য-সমাজ প্রভু আর্য্যদিগের অন্য বিশয়ে যেমন অনুকরণ করিবে, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ অনুকরণ করিবে। হিন্দুরা যে ঠাকুরের পূজা করে, তাহারাও সেই ঠাকুরের পূজা করিতে আরম্ভ করিবে। হিন্দুরা যে সকল উৎসব করে, তাহারাও সেই সকল উৎসব করিতে আরম্ভ করিবে। সমগ্র জাতি এইরূপ ব্যবহার করিত থাকিলে কালক্রমে তাহারাও হিন্দু নাম ধারণ করিবে। অন্য হিন্দু কেহ তখন তাহাদিগের অন্ন খাইবে না। তাহাদিগের সহিত মিশিবে না -হয় ত তাহাদিগের স্পৃষ্ট জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবে না। অতএব তাহারাও একটি পৃথক হিন্দু জাতি রহিল, কেবল হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণ গ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতি বলিয়া খ্যাত হইল।" (পৃ. ৩৫৪, বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ -এই উদ্ধৃতিতে পাশাপাশি বাক্যে ক্রিয়াপদের কাল, 'গণ্য হইবে'-র পরেই 'খ্যাত হইল', বঙ্কিমরচনায় যেমন আছে ঠিক তেমনই উল্লেখ করা হল।)

এইভাবে বাঙালির উৎপত্তি সম্পর্কে পর্যালোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধান্ত করেছেন, " ইংরেজ একজাতি, বাঙালীরা বহুজাতি। বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালী বলি, তাহদিগের মধ্যে চারিপ্রকার বাঙ্গালী পাই। এক আর্য, দ্বিতীয় অনার্য্য হিন্দু, তৃতীয় আর্য্যান্যার্য হিন্দু, আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী মুসলমান। চারিভাগ পরস্পর হইতে পৃথক থাকে। বাঙ্গালী সমাজের নিম্নস্তরের বাঙ্গালী অনার্য্য বা মিশ্রিত আর্য্য ও বাঙ্গালী মুসলমান; উপরের স্তরে প্রায় কেবলই আর্য্য। এই জন্যে দূর হইতে দেখিতে বাঙ্গালীজাতি অমিশ্রিত আর্য্যজাতি বলিয়াই বোধ হয় এবং বাঙ্গালার ইতিহাস এক আর্য্যবংশীয় জাতির ইতিহাস বলিয়া লিখিত হয়।" (পৃ. ৩৬৩, বঙ্কিম রচানাবলী, সংসদ) বলাই বাহুল্য বঙ্কিম চন্দ্রের এই আর্য হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ আমাদের জাতীয় ঐক্য সাধনে বিশেষ সহায়ক হয়নি। এর মধ্যে শুধু যে মুসলমানদেরই দূরে ঠেলে দেওয়ার মতো অ্যাটিচুড প্রকাশ পেয়েছে তাই নয়, অন্যান্য তথাকথিত অনার্য মানুষদেরও (যাদের সংখ্যাই বাঙালিদের মধ্যে বেশি এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখিত নিবন্ধেই যারা "হাড়ি, কাওরা, ডোম ও মুচি; কৈবর্ত্ত, জেলে, কোঁচ, পলি" ইত্যাদি নাম উল্লেখিত) হিন্দুসমাজে স্থান নির্ণয় খুব স্বস্তিকর হয়নি।

আমার এই রচনার উদ্দেশ্য এমন নয় যে বঙ্কিমচন্দ্রকে নানাদিক থেকে খাটো করে দেখানো। বাস্তবিক এই মহান লেখক সম্পর্কে তেমন কোন মনোভাবও আমার নেই। যিনি সাহিত্যসম্রাট এবং ঋষি নামে খ্যাত হয়েছেন, -- আমার মেতো ক্ষুদ্র মানুষের সাধ্য কি, তাঁকে খাটো করো? কিন্তু সমসাময়িক জীবনে প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্ন উঠলে কথা বিচার না উপায় থাকে না। অথচ আমাদের ভক্তি এমনই অন্ধ যে কোন কে সময়ে সাদরে গৃহীত ধ্যান-ধারণার কোন কোন অংশকে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে সমালোচনার বিচারবস্তু করে তুললে অনেকেই ষ্ট হন। এঁদের কাছে মার্জনা প্রার্থনা করেই আমি বলতে চাই, বাংলা ভাষা নির্মাণের প্রশ্নেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ব্রাহ্মণ্য আর্য হিন্দুত্বের অহংকারজনিত কারণে যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তাতে এই ভাষাকে বাঙালি আপামর জনসাধারণের বোধগম্যতার স্তর থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কারণ, মূলত অনার্য এবং মুসলমানপ্রধান এই বাংলা মুলুকে বাংলা ভাষাকে করে তোলা হয়েছিল আর্যভাষা সংস্কৃত নির্ভর। যদিও সেই সময় এমনকী খাঁটি আর্যদেরও মুখের ভাষা সংস্কৃত ছিল না। অথচ অপরিণত ভাষাকে পরিণত করে তোলার স্বাভাবিক নিয়ম বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন না এমন নয়। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর "বাঙলা ভাষা-লিখিবার ভাষা" শীর্ষক নিবন্ধ থেকে একটি অংশ এখানে উল্লেক করা যেতে পারে, - " প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবর্ত্তার ভাষায় সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচচভাষায় আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবু প্রদর্শিত সংস্কৃত বহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজনে হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই- নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে - যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অলি ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তারপর সেই রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিবে-কেন না, যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপর তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরর

প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে - লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সাধন হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী।" (পৃ. ৩৭৩, বঙ্কিম রচনাবলী, সংসদ) যে কোন ভাব প্রখাশে ভাষার নির্মাণ সম্পর্কে এর থেকে ভালো পদ্ধতি আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নিজে কি এই পদ্ধতি অনুসরণের প্রতি পুরোপুরি আস্থাশীল ছিলেন? তাহলে তাঁর বাংলা ভাষা থেকে তৎকালে বহুল ব্যবহৃত অ ারবি ফারসি শব্দগুলিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হল কেন? আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের ঝোঁকটাই ছিল মূলত সংস্কৃতবহুল বাংলা ব্যবহারের দিকে। যদিও তাঁর উপন্যাসগুলির কোন কোন অংশে বিশেষ করে কিছু কিছু পাত্র-পাত্রীর চরিত্র ফুটিয়ে তোল ার প্রয়োজন প্রচলিত সরল ভাষার যথাযথ ব্যবহার করে সেই সময়ের পাঠককুলকে তিনি চমকে দিয়েছিলেন। কিন্তু ভাষার আর্যীকরণ ঘটানো তার অন্যতম ব্রত হওয়ায় বাঙালির প্রচলিত ভাষার অনার্যপ্রাধান্য লাঘব করা এবং মুসলিম স্পর্শদো ষ মুক্ত করার ঝোঁক বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে প্রবল ছিল। উল্লেখিত নিবন্ধেই অন্যত্র একটু মনোনিবেশ করলেই টের পাওয়া যায় সংস্কৃতের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব কতখানি প্রবল ছিল। তিনি লিখেছেন, "বাঙ্গালা আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা, তাহার অভাব পূরণ করার জন্য অন্য ভাষা হইতে সময় সময় শব্দ কর্জ্জ করিতে হইবে। কর্জ্জ করিতে হইলে, চিরকেলে মহাজন সংস্কৃতে র কাছেই ধার করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনী; ইহার রত্নময় শব্দভান্ডার হইতে যাহা চাও, তাহাই পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ শব্দ লইলে বাঙ্গালার সহিত ভাল মিশে। বাঙ্গালার অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত। তৃতীয়তঃ সংস্কৃত হইতে নতুন শব্দ লইলে, অনেক বুঝিতে পারে; ইংরেজি বা আরবী হইতে লইলে কে বুঝিবে?" (পৃ. ৩৭২, বঙ্কিম রচনাবলী, সংসদ)।

বঙ্গিমচন্দ্র নিজেই বারবার উল্লেখ করেছেন, বাংলার অর্ধেক অধিবাসী মুসলমান। ধর্মীয় কারণে আরবি ভাষার সঙ্গে এদের সংস্পর্শ ছিল। সুতরাং কিছু কিছু শব্দ আরবি থেকে নিলে কেউ বুঝতো না - একথা কি ঠিক? মনে রাখতে হবে আরবি শুধু কোরানের ভাষা নয়, প্রাচীন গ্রীক জ্ঞানভান্ডার এই ভাষায় অনূদিত হয়েছিল এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সূচনা পর্ব ঘটেছিল এই ভাষাতেই। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের আগের প্রজন্ম পর্যন্ত এদেশে শিক্ষিত হওয়ার অর্থ ছিল ফারসি ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন। কারণ ফারসি ছিল রাজ ভাষা। রাজদরবার, আইন-আদালত সব কিছুই পরিচালিত হতো ফ ারসি ভাষায়। রামমোহনের সময় কলকাতায় শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা ছিল অকিঞ্চিৎকর তবুও তিনি ফারসি ভাষায় একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন; এর কারণ নিশ্চয়ই কলকাতায় শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে ফারসি জানা ব্যক্তির আ ধিক্য। এমন যে ভাষা ফারসি - যা আর্য ভাষা সংস্কৃতের মতই অন্য একটি প্রাচীন আর্যভাষা এবং যার শব্দভান্ডার সংস্কৃতের তুলনায় কিছুমাত্র ন্যূন ছিল না - এই ভাষা থেকে কিছু কিছু শব্দ নিলেও কেউ কি বুঝতো না? আরবি,ফারসি ভ াষার মত সমৃদ্ধ শব্দভান্ডার থেকে নতুন কোন শব্দ নেওয়া তো দূরের কথা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নির্মিত বাংলা ভাষার অবয়ব থেকে অতিপ্রচলিত আরবি-ফার্সি শব্দগুলিকে পর্যন্ত ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে ক্রিয়া করেছে সেই আর্য হিন্দুত্ববাদী অহংকারী মনোভাব। এইরকম মনোভাবের কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র জেনেশুনে বাংলা ভাষা বিকাশের স্বাভাবিক নিয়মের বিদ্ধতা করেছিলেন। 'জেনেশুনে' এই জন্যেই বলেছি, আগের উদ্ধৃতি অনুধাবন করলেই বোঝা যায় বাংলা ভাষা বাংলা ভাষা বিকাশের স্বাভাবিক নিয়ম তাঁর জানা ছিল। তথাপি এই ভাষাকে অনেকখানি সাধারণের বোধের অগম্য সংস্কৃতবহুল কৃত্রিম চেহারা তিনি দিয়েছিলেন, হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তার মতাদর্শে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আচ্ছন্ন থাকার কারণেই।

অবশ্য বাংলা ভাষার অবয়ব থেকে আরবি-ফারসি এবং তথাকথিত অনার্য শব্দ বর্জনের মনোভাব সেই সময় কেবলমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের একার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়নি। তখন হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণপন্থী কলকাতাকেন্দ্রীক আরও অনেক বুদ্ধিজীবীই জনজীবনে প্রচলিত ভাষার এইরকম কৃত্রিমতা সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। এর ফলে বাংলাভাষার নামে যে বস্তুর উদ্ভব ঘটে বহুকাল ব্যাপী তা দেশের গণমানসকে স্পর্শ করতে পারেননি। উনবিংশ শতকে নবজাগরণের নামে কলকাতার এলিটমহলের বৌদ্ধিক আলোড়ন যে দেশের তৃনমূল স্পর্শ করতে পারেননি, এর অন্যতম কারণ এইসব এলিট লিখিত ব াংলাভাষায় কৃত্রিম চেহারা। বিশেষ করে এই ভাষায় অবয়ব থেকে প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দগুলিকে বর্জন করা বাস্তব বুদ্ধির পরিচায়ক হয়নি।

এর প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে মারাত্মক হয়েছিল বাঙালি মুসলমান গণমানসে। নিজেদের বাঙালি না মনে করে প্রথম দিকটায় ব াংলার শিক্ষিত মুসলমান এলিটদের মধ্যে উর্দুঘেঁষা মুসলমানি আইডেনটিটি বোধের যে প্রাবাল্য দেখা দেয়; এমনকি ব

াংলা তাদের মাতৃভাষা কিনা -এই নিয়েও যে নির্বোধ বিতর্ক শু হয়-এর মূলে অন্যতম কারণ হিসাবে দায়ী করা যায় বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র নির্মিত সংস্কৃতবহুল বাংলা ভাষাকে, যাতে বাঙালি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দগুলি সযত্নে বর্জিত হয়েছিল। লিখিত ভাষার এইরকম চেহারা দেখে এটা আদৌ তাদের মাতৃভাষা কিনা সে সম্পর্কে দ্বিধান্বিত মনোভাব জেগে ওঠে। এর মূলে অবশ্য অন্য অনেক সামাজিক-রাজনৈতিক কারণও ছিল। যদিও একথা ঠিক, অচিরেই বেশীরভাগ শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান এইরকম নির্বোধ দ্বিধাকে ঝেড়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এরপরেও বহুক াল বাংলা ভাষার আদত চেহারা নিয়ে বাঙালি মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে প্রচুর বাকবিতন্ডা হয়েছে, সংস্কৃত শব্দ ব্যবহ ারের বাড়াবাড়ির প্রতিত্রিয়া হিসাবে অপ্রয়োজনীয় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা দেখা গেছে, এমনকি বাংলা ভ াষা আরবি হরফে লেখা হবে কিনা এই নিয়েও প্রবল বিতর্ক হয়েছে। এই ভাবে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের ভাষাগত সংহতি-ও বহুল পরিমাণে ব্যাহত হয়েছে। এইসব কারণেই এমন কথা না বলে উপায় নেই, বাংলা ভাষার বিকাশ সাধনের যে পদ্ধতি বঙ্কিম চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন - ‘‘আমরা দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তি মতি।’’ - তা নির্ভুল হলেও আর্য -হিন্দুত্ববাদী জাত্যভিমানের কারণে প্রয়োজনের অতিরিক্তি সংস্কৃত নির্ভরতা সেই পদ্ধতি অনুসরণকে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত করেছিল আর এইভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছিল বাঙালি জনসাধারণের মধ্যে ভাষাগত সংহতির সংকট।